The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol.33, 2015 (P. 277-296)

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : প্রথম দশকের অভিজ্ঞতা

শারমিলা কবির সীমা [1]

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টা একটা অমিমাংসিত বিষয়। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু, উচ্চ আদালত কর্তৃক ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করার ফলে বিতর্কটি আবারো আলোচনায় চলে আসে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক বিতর্কটা দীর্ঘদিনের। এ বিতর্কটি নিয়ে কিছু লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু, এসব লেখালেখির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইস্যুটির বিবর্তনকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তুলে ধরা হয়নি। এই প্রবন্ধে পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশের প্রথম দশকে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইস্যুটির আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের বিচারবিভাগের স্বাধীনতার ইস্যুটির বিবর্তনকে ঐতিহাসিক ভাবে উত্থাপন করা। যেহেতু এটি একটি ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ, তাই এখানে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা নিয়ে যে বিতর্ক আছে তা বুঝার প্রয়াসকে যথাযথ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা সম্ভব হবে।

ভূমিকা : গবেষণা সমস্যা

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়টা আজও একটা গুরুত্বপূর্ণ ও অমীমাংসিত বিষয় হয়েই রয়ে গিয়েছে। সর্বশেষে দশম জাতীয় সংসদে পাশকৃত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত করা এবং সে ষোড়শ সংশোধনী উচ্চ আদালত কর্তৃক বাতিল করার ফলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগে স্বাধীনতার ইস্যুটি আবারও পাবলিক ডিবেটের বিষয়ে পরিণত হয়।[২]

এই বিতর্কটা ক্রমশঃই রাজনৈতিক বিভাজনের ছকে পড়ে যায়। এই বিতর্কের অন্যতম একটি আলোচিত বিষয় ছিল বাংলাদেশে প্রথম দশকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক ইস্যুটির বিবর্তন নিয়ে ইনফরমেটিভ আলোচনা। বক্ষমান প্রবন্ধটি সেই শূন্যতা পূরণেরই অতি ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস। এ প্রবন্ধে বিচার বিভাগ, এর স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পূর্বশর্তসমূহ, বাংলাদেশে বিচার বিভাগের গঠন কাঠামো, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ে বিতর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি, বাংলাদেশের প্রথম দশকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ ও তার বিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইস্যুটি এতদসংক্রান্ত

---

[1] প্রভাষক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ। ইমেইল: sharmilasheema@gmail.com

[২] "16th Amendment Debate: Here is What You need to know", *Dhaka Tribune,* 18 August, 2017. Sarkar, Ashotosh and Shakhawat Liton, "Bangladesh Highcourt scraps 16th amendment to constitution", *The Daily Star,* 06 May, 2016.

সাংবিধানিক ধারাসমূহের আলোকেই আলোচনা করা হয়েছে। নিম্ন আদালতকে আরো স্বাধীন করার জন্য মাসদার হোসেন মামলায় কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[৩]

বিচার বিভাগের পক্ষে আইন প্রয়োগ করা তখনই সম্ভব যখন বিচার বিভাগ স্বীয় কর্মের অধিক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। বাংলাদেশের দশম সংসদে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা ১৯৭২ সালের সংবিধানের ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদকে পুনরায় হস্তান্তর করে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী পাশ করা হয়।[৪] তবে, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার (এস. কে. সিনহা) নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সেই ষোড়শ সংশোধনীকে বাতিল বলে রায় প্রদান করেন।[৫]রায়ে আপীল বিভাগ এই মত পোষণ করেন যে, জাতীয় সংসদের সদস্যদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের এখতিয়ার থাকলে তা রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত হতে পারে, রাজনৈতিক কারণে এর অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রায়ের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ, গণতন্ত্রের ঘাটতি, প্রচন্ড দলমন্যতা এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সংসদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।[৬] প্রকৃতপক্ষে, ষোড়শ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত রায়ে ও পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হলো,

যেহেতু সংসদ (২০১৪ সাল নির্বাচিত) অবাধ, নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ও সকল দলের অংশগ্রহণ ভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়নি, সেহেতু সংসদ প্রবলভাবে দলমন্য হয়ে পড়েছে। তাই ১৯৭২ সালে যে "আদর্শ" সংসদকে সামনে রেখে অভিসংশন পদ্ধতি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বিধৃত হয়েছিল, বর্তমান (২০১৬ সালের) অবস্থাতে সেটা আর বাস্তবসম্মত ছিল না।[৭] ফলে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি অমীমাংসিতই রয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক বিতর্কের একটি ধারাবাহিক বিবর্তন আলোচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক বিতর্কটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধটি একটা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ। ফলে, এখানে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি প্রাসঙ্গিক নয়। এ প্রবন্ধের তথ্যাবলী সংগ্রহের ক্ষেত্রে উৎস

---

[৩]এ প্রসঙ্গে মাসদার হোসেন মামলার রায়ে পর্যায়ক্রমে নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন করার জন্য সর্বোচ্চ আদালত বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। অদ্যাবধি সে নিদের্শনাগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন হয়নি। এখনও নিম্ন আদালত স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে নি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Islam, M. Rafiqul, "Independence of the Judiciary: The Masdar case", *The Daily Star*, 10 March, 2014; M.M. Hossain, ``Seperation of Judiciary in Bangladesh, Constitutional Mandates and Masdar Hossain Case's Directions: A Post-Seperation Evaluation,`` *International Journal for Court Administration,* 11(2), P.4. Dol: http://dol.org./10.36745/ijca.310.

[৪] রশীদ, আমীন আল, "ষোড়শ সংশোধনী: বাহাত্তর ও মৌলিক কাঠামোর তর্ক", *বাংলা ট্রিবিউন*, ১০ জুলাই ২০১৭।

[৫] "ষোড়শ সংশোধনী বাতিল: আপিল বিভাগের পূর্নাঙ্গ রায় প্রকাশ", *বাংলা ট্রিবিউন*, ১ আগষ্ট ২০১৭; "ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষনার পূর্নাঙ্গ রায় প্রকাশিত", *প্রথম আলো*, ১ আগষ্ট ২০১৭।

[৬] "ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়: ৭০ অনুচ্ছেদ কথকতা", *bdnews24.com*, ১৯ আগষ্ট ২০১৭।

[৭]Shaon, Asif Islam ''16th Amendment scrapped, parliament loses power to impeach judges'', *Dhaka Tribune*, 3 July 2017.

হিসেবে সংবিধান, সাংবিধানিক আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাদি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকার বিষয়ক প্রকাশনাসমূহ, বিভিন্ন জার্নাল, ম্যাগাজিন, নিউজ পেপার ও অনলাইন উৎস সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। এ বিতর্ক নিয়ে লেখালেখি কিছুটা যে হয়েছে সেটা ঠিক। তবে, এসব লেখালেখির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান বিতর্ককে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইস্যুটির বিবর্তনকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তুলে ধরা হয়নি। ফলে, এতদসংক্রান্ত বিতর্কটা পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ পারস্পেকটিভ থেকে হয়নি। এই বক্ষমান প্রবন্ধে পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশের প্রথম দশকে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইস্যুটির বিবর্তনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বক্ষমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইস্যুটির বিবর্তনকে ঐতিহাসিকভাবে উত্থাপন করা। সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১. বাংলাদেশের পূর্বসূরী পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় দেশই ব্রিটিশ লিগ্যাল ট্রাডিশনের অনুসারী। সে হিসেবে পাকিস্তান আমলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিবর্তন আলোচনা করা হবে। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইস্যুটি আলোচনা করা হবে।

২. ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেমন ছিল, ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি পাশকৃত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী মোতাবেক বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তন হয় সেটা দেখাও এই প্রবন্ধের একটা উদ্দেশ্য। সবশেষে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-পরবর্তী সামরিক শাসনের অধীনে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেমন রূপ পরিগ্রহ করে, সে সম্পর্কে আলোচনাও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত বিতর্ক বোঝার প্রয়াসকে যথাযথ ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করা সম্ভব হবে।

পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি একটা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ। ফলে, এখানে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি প্রাসঙ্গিক নয়। এ প্রবন্ধের তথ্যাবলী সংগ্রহের ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে সংবিধান, সাংবিধানিক আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাদি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকার বিষয়ক প্রকাশনাসমূহ, বিভিন্ন জার্নাল, ম্যাগাজিন, নিউজ পেপার ও অনলাইন উৎস সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

যে কোন দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যে কোন আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে কয়েকটা বিষয়ে ধারণা নেয়া প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হলো বিচার বিভাগ কি? সাধারণভাবে বলা যায় যে, সরকার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারের যে কয়েকটা বিভাগ থাকে, বিচার বিভাগ সেই ধরনের একটা অঙ্গ বা বিভাগ। অর্থাৎ, বিচার বিভাগ হচ্ছে সরকারের সেই বিশেষ বিভাগ যার কাজ হচ্ছে দেশের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন, প্রচলিত নিয়ম, প্রথা, বা

প্রয়োজন বিশেষে বিচারকদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন মোকদ্দমা পরিচালনা করে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি ও নির্দোষ ব্যক্তিকে খালাস দেবার রায় প্রদান করা। বিচার বিভাগের কাজের এ প্রকৃতি থেকে একটা বিষয় স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, একটা সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ মৌলিক চরিত্রগতভাবে পৃথক। কারণ, আইন ও শাসন বিভাগের কার্যাবলী পরিচালিতই হয় সরকারী নীতি-আদর্শ অনুযায়ী এবং এই দুটো বিভাগের উদ্দেশ্যই থাকে সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণ। কিন্তু সরকারের একটা বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সরকারী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিচার বিভাগের কাজ কর্ম সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে পরিচালিত হয় না; বরং বহুক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগ সরকারী আইন বা হুকুম বা যে কোন প্রকার কাজের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারে এবং দিয়ে থাকে। আর এ থেকে আসছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টা। কেননা, সরকারের একটা অঙ্গ হয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার অধিকারই বিচার বিভাগকে সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে আলাদা করে। আর, সে দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সক্ষম হতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় এমন একটা অবস্থা যেখানে বিচারকগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ভীতি ও বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়াই বিচারিক কাজ সম্পাদন করতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচারকগণের রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ প্রতিহত করবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। বিচারকগণ হবেন স্বাধীন এবং কেবল মাত্র আইনের অধীন।

প্রতিটা দেশেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আর সে কারণেই প্রতিটা দেশের সংবিধানেই বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়ে থাকে। তাই কোন দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম কিনা তা জানতে হলে যে যে অবস্থা একটা দেশের বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক) বিচারকগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার সম্ভাবনা দূর করবার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি স্থির করা দরকার। উল্লেখ্য যে, বিচারকগণের নিয়োগের পদ্ধতি একটা আপেক্ষিক বিতর্কিত ব্যাপার। কারণ, বিচারক নিয়োগের প্রতিটা পদ্ধতিরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাই, সাধারণভাবে বলা চলে যে, বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দেশে যে প্রচলিত পদ্ধতি আছে, সে পদ্ধতির উপর যদি বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকে তবে সে দেশের জনসাধারণের জন্য সেই পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে গণ্য হবে। অবশ্য সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন অবস্থাতেই নিয়োগ প্রাপ্তির ব্যাপারে যেন বিচারকগণের উপর শাসন বিভাগের সরাসরি প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ না থাকে।

খ) সদাচরণ সাপেক্ষে বিচারকগণের চাকুরীর স্থায়িত্ব বিধান করা দরকার। এ বিষয়টা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন বিচারকেরা তাদের চাকুরী হারাবার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত না থাকেন এবং যেভাবেই তাঁরা নিযুক্ত হোন না কেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগে অপরাধ বা

অযোগ্যতার কারণে বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া তাঁদেরকে অপসারণ করা যাবেনা।[৮] বিভিন্ন দেশে অপসারণের বিভিন্ন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ব্রিটেনে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস কর্তৃক অভিশংসন এবং কোন কোন রাষ্ট্রে বিচারক বা উচ্চস্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার। যদি এ ধরনের পদ্ধতি রাখা না হয়, তবে সর্বদাই বিচারকগণ তাঁদের চাকুরীর অনিশ্চয়তাজনিত কারণে চিন্তিত ও বিচলিত থাকবেন এবং তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হবেনা। তাঁরা সর্বদাই নির্বাহী বিভাগের "শাস্তির" ভয়ে থাকবেন।

গ) বিচারকদের যোগ্যতা, সততা ও নিষ্ঠার উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। কারণ, বিচারকদেরকে নিয়েই বিচার বিভাগ গঠিত। বিচারকগণ যদি অসদুপায় অবলম্বন করেন, অন্যায়, অনাচার ও অসৎ পন্থা অবলম্বন করেন, তবে সে অবস্থাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকবে- এমনটা আশা করা অবাস্তব।

ঘ) বিচারকগণকে বিচারের ব্যাপারে সরকার, আইনসভা, নির্বাচকমন্ডলী বা জনমতের প্রভাব বা হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। বিশেষ করে কোন মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আদালতের উপর সরকারের অন্যান্য বিভাগ বা বিচার মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশ দেয়া চলবে না। যদি এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত রাখা না যায়, তবে বিচার বিভাগকে সরকারী নির্দেশ, পরামর্শ মত কাজ করতে হবে। ফলে, বিচার বিভাগের পক্ষে স্বাধীনভাবে আইনের প্রয়োগ করা তথা তার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণও অসম্ভব হয়ে উঠবে।

ঙ) বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার একটা অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে এই যে, বিচারের ক্ষেত্রে আইনসঙ্গতভাবে গঠিত সাধারণ আদালতের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে। এ ব্যাপারে সাধারণ বিচার আদালত ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কর্তৃত্ব থাকাটা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে চরমভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

চ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে সামরিক শাসন বা জরুরী অবস্থা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে দেশে সামরিক শাসন বা জরুরী অবস্থা থাকা চলবে না। এ প্রসঙ্গে John J. Johnson তাঁর 'The Role of the military in Underdeveloped Countries' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জরুরী অবস্থা বা সামরিক শাসনের অধীনে কোন দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনা।[৯]

এছাড়া উপযুক্ত বেতন, সামাজিক মর্যাদা, অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান, ক্ষমতা বিভাজন নীতির অনুসরণ, অবসরত্তোরকালীন জীবনে আইনজ্ঞ হিসেবে কাজ করবার উপর বাঁধা নিষেধ আরোপ প্রভৃতি পদ্ধতিকেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

---

[৮] হালিম, মোঃ আব্দুল, (১৯৯৮), *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ (বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ)*, ঢাকা, পৃ. ২৭৮-২৮৫.

[৯] Johnson, John J (1962), *The Role of the Military in Underdeveloped Countries,* Princeton University Press, Princeton.

তদুপরি, বলা যায় যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারা বা না পারাটা বহুলাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র, বিচারপতিদের মানসিকতা, তাঁদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতার তারতম্য হয়ে থাকে।[১০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত যে ধারণা পাওয়া যায় তার আলোকে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ জানতে পারা যাবে; তথা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত মূল্যায়নের চূড়ান্ত আলোচনায় যাবার পূর্বে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সংগঠন সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সংগঠন

বাংলাদেশে দু'ধরণের আদালত ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। যথা: উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের উচ্চ আদালতের সর্ব শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীমকোর্ট। সুপ্রীমকোর্টের আবার রয়েছে আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। আর নিম্ন আদালতের মধ্যে সর্বশীর্ষে রয়েছে প্রতিটি জেলায় অবস্থিত জেলা জজের আদালত। এর পরবর্তী স্তরে ছিল মহুকুমা পর্যায়ে দেওয়ানী বিচারের জন্য মুন্সেফী আদালত, আর ফৌজদারী বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। তবে, বর্তমানে প্রশাসনিক স্তর হিসেবে মহুকুমা বিলুপ্তির পর থেকে মহকুমা আদালত নাই।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝতে ও বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মূল্যায়নের সুবিধার্থে আমাদের নিকট অতীত অর্থাৎ পাকিস্তানী শাসনামলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেমন বা কতটুকু ছিল সেটা দেখা দরকার।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। এ সংবিধানের সবচেয়ে বড় আদর্শ ও সর্বজন প্রশংসিত ব্যবস্থা ছিল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। সাংবিধানিক সংকট ছিল পাকিস্তানের একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তবুও এ ধরনের অহরহ সাংবিধানিক সংকটের সময় আদালতগুলো স্বাধীন মতামত প্রদানের ও বিচারের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে প্রয়াস পেয়েছিল। এমনকি, সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন আইনের পর্যালোচনার ক্ষমতাও বিচার বিভাগের ছিল। সর্বোপরি, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষাকল্পে আদালত সরকারের প্রতি রুল জারী করবারও অধিকারী ছিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিতেও আদালত কসুর করেনি।

কিন্তু এ অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয়নি। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী ও ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খাঁন কর্তৃক প্রণীত নয়া প্রায়-একনায়কতান্ত্রিক সংবিধানের মাধ্যমে

[১০] Chowdhury, M. Jashim Ali (2010), *An Introduction to the Constitutional Law of Bangladesh*, Northern University Bangladesh, Dhaka, Pp-435-436.

বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয় এবং বলা চলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কে.বি. সাঈদের মতে ১৯৬২-র সংবিধান পাকিস্তানে "সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করেছিল।[১১] ১৯৬২ সালের সংবিধানে বিভিন্ন ভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করা হয়। যেমন; ১৯৫৬ সালের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণার্থে আদালতের রুল জারী করার যে অধিকার স্বীকৃত ছিল, ১৯৬২ সালের সংবিধানে তা স্থগিত করা হয়। অবশ্য শেষ দিকে আদালতকে আবার এ অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের ১৭৪ ধারাতে এরূপ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে মেয়াদকালের মধ্যে অসম্মানজনকভাবে বিচারকগণের সুবিধাদি হ্রাস করা হবে না। কিন্তু ১৯৬২ সালের সংবিধানে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিচারপতিদের পদচ্যুতির ব্যাপারে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ১৫১ ধারায় পার্লামেন্ট কর্তৃক ইমপীচমেন্টের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকার করা হয়নি। বরং আয়ুব খাঁন নুতন সংবিধানে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে এর মাধ্যমে তদন্ত করিয়ে বিচারকগণের পদচ্যুতির ব্যবস্থা করেন।[১২]

সর্বোপরি, সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠতার নীতি অনুসারে সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টে বিচারপতিদের মধ্য থেকে দেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের রীতিকে খেলাপ করে আয়ুব খাঁন বাইরে থেকে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন আইনজীবিকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে নিয়োগ দান করেন।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের বিচার বিভাগ যে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত, ১৯৬২ সালে প্রণীত প্রায় একনায়কতান্ত্রিক "আয়ুবী" সংবিধানে তার বিলুপ্তি ঘটে।[১৩] অবশ্য নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করবার প্রতিশ্রুতি যদিও ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৩০ ধারায় দেয়া হয়েছিল; তবুও সেটা ছিল 'সেমান্টিক' বা বাকসর্বস্ব। কারণ, সে সময়েও নয়; এমনকি পরবর্তীকালেও কোন সময়েই তা কার্যকরী হয়নি।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে জাতি নতুন সংবিধান পায়। তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেশে বেশ অনেকগুলো সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। বেসামরিক সরকারের পরিবর্তে দেশ প্রায় পনের বছরের মত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক সরকারের দ্বারা শাসিত হয়েছে। মূল সংবিধানের উপর সতেরটা মৌলিক ও ব্যাপক মাত্রার সংশোধনী সংযোজিত হয়েছে। বর্তমানে তা এক এবড়ো থেবড়ো রূপ নিয়েছে। আর এ সমস্ত পরিবর্তন ও সংশোধনীর ফলে যে বিচার বিভাগও প্রভাবিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের সংশোধনী বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথকে কিছুনা কিছু পরিমানে যে খর্ব বা সীমিত ও

---

[১১]Sayeed, Khalid Bin (1967), *The Political System of Pakistan*, Oxford University Press, Lohore Karachi Dacca, Pp: 101-126.

[১২]Chowdhury, G.W (1969), *Constitutional Development in Pakistan*, Longman Group Ltd., London and Harlow, Pp-237-238.

[১৩]*Ibid.*

কন্টকাকীর্ণ করেছে, তা অনস্বীকার্য। তদুপরি, সামরিক শাসনের অধীনে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও গুরুত্ব চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানানুযায়ী বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৭২ সালে। এই সংবিধানের ষষ্ঠভাগে বিচার বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪] এখানে বিচার বিভাগ সম্পর্কে যে সমস্ত ধারাসমূহ নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ না হলেও কিছু পরিমাণে পূর্বে বর্ণিত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার শর্তাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে যেমন বিচার বিভাগকে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হয়, তদ্রুপভাবে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানেও সে ধরনের স্বাধীনতা প্রদানের প্রচেষ্টা লক্ষ্যনীয়।

ক) ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৫ (১) ধারা অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের বিচারপতিগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রধান বিচারপতি নামমাত্র প্রধান অনির্বাহী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং অন্যান্য বিচারকগণ প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে অনির্বাহী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।[১৫] এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানানুযায়ী বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির তথা বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং বিচারকগণের নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একতরফাভাবে কোন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না; যাতে করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিনষ্ট হতে পারে। এ দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে এটা বলা চলে যে বিচার বিভাগকে এই সংবিধানে স্বাধীন থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

খ) সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ৯৬ এর (২) ধারাতে বিচারপতিদের "ইমপীচমেন্ট" বা অভিশংসন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে শর্তের প্রয়োজন তা পূরণ করতে মোটামুটি ভাবে সক্ষম হয়। কারণ, বিচারপতিদের অপসারণ সর্বদা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে হওয়া উচিৎ; যাতে করে তাঁদেরকে ইচ্ছেমত যখন তখন পদচ্যুত করা না যায় এবং তাঁরা যেন সর্বদাই চাকুরী হারাবার আশংকায় শঙ্কিত না থাকেন। অপসারণ সংক্রান্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৬ (২) ধারাতে অপসারণের বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করে বলা হয়েছে যে, প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারণ করা যাবে না। অপসারণের ব্যাপারে এ ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা মূল সংবিধানে থাকাতে বিচারপতিদের চাকুরীকালের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্তভাবে ভয় ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে তাঁদের কার্য পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিল।

গ) ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ১০৯[১৬] ধারা মতে সকল অধঃস্তন বা নিম্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্ট বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা দেয়া হয়। এছাড়া,

[১৪] আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০০), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, পৃষ্ঠা: ৩৮-৪৭

[১৫] Chowdhury, M. Jashim Ali (2010), *Op.cit.*, P.439.

[১৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, *পূর্বোল্লিখিত*, পৃ. ৪৫.

১১৫নং ধারা অনুযায়ী, প্রথমতঃ বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে, জেলা বিচারকের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশক্রমে; এবং দ্বিতীয়তঃ অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারী কর্ম-কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে করে বিচার আদালতের সর্বস্তরে তথা সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টে এবং অধঃস্তন আদালতেও বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কারণ অনির্বাহী রাষ্ট্রপতি (নামমাত্র প্রধান) যে কোন বিচার পতিকে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের পরামর্শ নিতে বাধ্য থাকতেন। এ ব্যবস্থাটা নিঃসন্দেহে বিচারবিভাগের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল।

ঘ) সংবিধানের ১১৬নং ধারার মতে বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রন এবং শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত তথা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল।[১৭] এতে করে বিচার বিভাগের তথা বিচারপতিদের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের ব্যাপারে সরকারের অন্য কোন বিভাগের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছিল এবং এভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার যে একটা অন্যতম পূর্বশর্ত বিচার বিভাগের স্বকীয়তা রক্ষা, সেই শর্ত পূরণ করা হয়েছিল।

ঙ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতার একটা মূল দিক হচ্ছে যে, বিচারের ক্ষেত্রে আইন সঙ্গত ভাবে গঠিত আদালতের একচ্ছত্র অধিকার থাকা। সাধারণ বিচার আদালত ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কর্তৃপক্ষের হাতে সে অধিকার থাকা এবং তদুপরি সে কর্তৃপক্ষ যদি বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকে, তবে সেটা হবে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে অ-সামঞ্জস্যপূর্ণ। এদিক থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১০৯ ধারাতে হাইকোর্ট বিভাগের অধীন সকল অধঃস্তন আদালতের উপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।[১৮]ফলে, স্বভাবতই এটা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার পথকে সুপ্রশস্ত করেছিল বলা চলে।

চ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তথা বিচার বিভাগ সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে ও স্বাধীনভাবে তার কাজ করতে পারছে কিনা তা অনেকাংশে নির্ভর করে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণার্থে 'রুল' জারী করবার অধিকার আদালতের আছে কি নেই সেটার উপর ভিত্তি করে। এ দিক থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১০২ ধারাতে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণার্থে 'রুল' জারীর অধিকার বিচার বিভাগকে দেয়া হয়েছিল। এটা বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম করতে এবং বিচার বিভাগের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল।

এছাড়াও বিচারপতিদের বেতন অন্যান্য সরকারী কর্মচারী অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বেশী এবং সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও সমাজে তাদের স্থান অতি উর্ধ্বে দেয়া হয়। সর্বোপরি ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৯ ধারা বলে অবসরোত্তরকালীন জীবনে তাদের উপর আইনজ্ঞ হিসেবে বা সরকারী কোন লাভজনক পদে কাজ করবার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে, এসব বিবেচনায়ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিছুটা ছিল বলা যেতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে

---

[১৭]Chowdhury, M. Jashim Ali (2010), *Op.cit.,* P.445.

[১৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পূর্বোল্লিখিত*, পৃ. ৪৫.

আর যাই হোক এটুকু বলা চলে যে, সাংবিধানিক ধারা ও বিধি বিধানের বিচারে তাত্ত্বিকভাবে ও পশ্চিমা উদারনৈতিক ব্যাখ্যা অনুসারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বজায় রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল।

চতুর্থ সংশোধনী ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী তারিখে ২নং আইন দ্বারা সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী সংযোজিত করা হয়। এই চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী সংবিধানের ৯০, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৯, ১১৫, ১১৬ নম্বর ধারা সমূহের ব্যাপক রদবদলের ফলে আদালতের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ভীষণভাবে খর্ব হয়।

প্রথমতঃ ১৯৭২ সালের মুল সংবিধানে ১১৫ ধারা মোতাবেক বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজের নিয়োগ দান করতেন অনির্বাহী রাষ্ট্রপতি (নামমাত্র প্রধান) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করে দেয়া হয় এবং তাদের নিয়োগের দায়িত্ব চুড়ান্তভাবে নির্বাহী বিভাগের কার্যকরী প্রধান (নামমাত্র প্রধান নন) হিসেবে নির্বাহী রাষ্ট্রপতির হস্তে অর্পন করা হয়। এভাবে উচ্চ ও নিম্ন উভয় আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগের একমাত্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগীয় কার্যকরী প্রধান বা নির্বাহী রাষ্ট্রপতির হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্বিত হয়েছিল।[১৯]

দ্বিতীয়ত ঃ মূল সংবিধানের ৯৬ ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রস্তাবক্রমে অনির্বাহী রাষ্ট্রপতি (নামমাত্র প্রধান) কর্তৃক ইমপীচমেন্ট এর যে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সে ব্যবস্থাটাকে বাতিল করে দেয়া হয় ও বিচারপতিদের পদচ্যুত করবার সকল ক্ষমতা এককভাবে নির্বাহী বিভাগের কার্যকরী প্রধান হিসেবে নির্বাহী রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়।[২০]

তৃতীয়ত ঃ এই সংশোধনীর ফলে যেহেতু বিচারকগণের অপসারণ ও নিয়োগের সকল অধিকার[২১] এককভাবে নির্বাহী বিভাগীয় কার্যকরী প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তাই তিনি সরাসরি বিচারকগণকে নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারতেন। এর ফলে বিচার বিভাগের পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে উঠে।

চতুর্থতঃ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানে ১০৯ ধারার সংশোধনীর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত, সেগুলোর উপর থেকে সাধারণ বিচার আদালতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে নেয়া হয়। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বহুলাংশে ক্ষুন্ন ও খর্ব হয়েছিল।[২২]

---

[১৯]Ahmed, Moudud (2015), *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman,* The University Press Limited, Dhaka, P.283.

[২০] Maniruzzaman, Talukder (2009), *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, University Press Limited, Dhaka, P. 171.

[২১] সাহা, অসীম কুমার (২০০৮), *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস*, ঢাকা, পৃ. ৯৬-১০৭।

[২২]Ahmed, Moudud (2015), *Op.cit.*, P.284.

পঞ্চমত ঃ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানের ১১৬ ধারা সংশোধন করে বিচারবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান তথা তাদের কর্মস্থল নির্ধারণ; পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরীসহ সকল দিক ও আদালতের শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব এককভাবে নির্বাহী বিভাগীয় কার্যকরী প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বীয় হস্তে ন্যস্ত করা হয়।[২৩] এই সংশোধনীর ফলে বিচার বিভাগের যে স্বীয় পৃথক ও আলাদা একটা স্বত্ত্বা থাকে সেটা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বিচার বিভাগের উপর থেকে বিশেষতঃ নিম্ন আদালতের উপর থেকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব ও একচ্ছত্র অবস্থাকে রহিত করবার যে বিধান ১১৬ ধারার ছিল সংশোধনীর মাধ্যমে সে দাবীর সমূলে কুঠারাঘাত করা হয়। কিন্তু এ দাবীটা বিচারবিভাগের স্বাধীনতার একটা অতি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।

ষষ্ঠত ঃ ১৯৭২ সালের সংবিধানের যে একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক রুল জারীর ক্ষমতা, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সেই রুলজারী সংক্রান্ত ১০২ ধারার কার্যকারীতা স্থগিত বা সাসপেন্ড রাখা হয়েছিল।[২৪]এটা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদার বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত ছিল।

এভাবে, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বিচার বিভাগকে যেটুকু স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ তার কার্যকরী প্রধান রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিচারবিভাগের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব খাটাবার ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু এর পরেও ১১৬(ক) ধারা নামে একটা ধারা সংবিধানে যুক্ত করে তাতে বলা হয় যে, বিচার বিভাগে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি ও বিচারক বিচার সংক্রান্ত কাজে স্বাধীন থাকবে।[২৫] বলা বাহুল্য, এই ১১৬(ক) ধারাটির বাস্তব কোন গুরুত্ব ছিল না বললেই চলে।[২৬]

সামরিক শাসন, পঞ্চম সংশোধনী ও বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার স্বরূপ

সরকার পরিবর্তনের ধারায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ও ৭ই নভেম্বর থেকে তৎপরবর্তী সাড়ে তিন বৎসর যাবৎ চালু থাকা সামরিক শাসন এবং ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বহুল আলোচিত সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী পাশের ফলে তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতটুকু ছিল বা ছিল না তা নিম্নের আলোচনা থেকে বুঝা যাবে।

John J. Johnson তাঁর 'The Role of the Military in Underdeveloped Countries'নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সামরিক শাসনের অধীনে কোন দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে স্বীয় কার্য সম্পাদন করতে পারেনা।[২৭] তদ্রুপ ভাবে, বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পরবর্তী সামরিক শাসনামলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ তেমন স্বাধীন ভাবে যে কাজ করতে পারেনি সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ, ১৯৭৫

[২৩]*Ibid,* P.283.
[২৪]*Ibid,* P.284.
[২৫] হক, কাজী এবাদুল (১৯৯৮), *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৪৬।
[২৬]Chowdhury, M. Jashim Ali (2010), *Op.cit.,* P.446.
[২৭]Johnson, John J (1962), *Op.cit.,*

সালের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী দেখা গেছে যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা আদালতগুলোকে সাধারণ বিচার আদালতের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছে। আর সামরিক শাসনামলে বিশেষ সামরিক আদালতে বিচারের মাধ্যমে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত ক্ষমতা বেশী মাত্রায় প্রয়োগ হয় এবং এগুলো কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলত না। ফলে, স্বভাবতঃই এটা বিচার বিভাগের পক্ষে স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদনের পথে বাঁধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও, সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অধ্যাদেশ জারী হয়, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী হিসেবে কাজ করেছে। সর্বোপরি, সামরিক সরকারের প্রায় সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর ২নং আইনের মাধ্যমে জারীকৃত চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্বকারী ধারা সমূহের দু'একটা বাদে আর কিছুই তেমন পরিবর্তন করা হয়নি, যাতে করে বিচার বিভাগের খর্বকৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা যায়, যদিও বিচারপতিদের বরখাস্ত করবার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির একক কর্তৃত্ব বাতিল করে আয়ূবী ধাঁচের সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হয়; যা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তৎপরবর্তী দু'জন সিনিয়র বিচারপতি নিয়ে গঠিত হয়।[২৮] এছাড়া ১৯৭৬ সালের ২৬ শে মে থেকে সামরিক সরকার মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে বিচার বিভাগকে রুল জারী করবার অধিকার পুনরায় চালু করা হয়। অবশ্য, যেহেতু তখনও জরুরী আইন বহাল ছিল, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা বিচার বিভাগের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং এর ফলে বিচার বিভাগের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছিল না। যেমন- মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইনিস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস বনাম আব্দুল খালিকের ১৯৭৩ সনে দায়েরকৃত মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, দেশে এখনও মৌলিক অধিকার পুণঃ প্রতিষ্ঠিত না হবার কারণে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে মামলার শুনানি স্থগিত রাখার আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরী তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আদালতকে জানান, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকার পুণঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কারণ দেশে এখনও জরুরী আইন আছে। তাই এ থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, সামরিক সরকার যদিও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অতি সামান্য পরিমানে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল, তথাপি বাস্তবে সামগ্রিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি।

সর্বশেষে দেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে যে পঞ্চম সংশোধনী পাশ হয় সেটার মাধ্যমেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে দেশ সামরিক আইনের অধীনে থাকাকালীন বিশেষ আদালতে যে সকল বিচার হয় সেগুলোর প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ বিচার আদালতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপীল করা যেতনা।[২৯] এছাড়া এই পঞ্চম সংশোধনী বিলে ২৫৪টি অর্ডিন্যান্স, ২৩টি সামরিক আইন ফরমান, ১২টি সংবিধানের সংশোধন এবং ৫৩টি সামরিক আইন প্রবিধান এবং প্রায় সাড়ে নয়শত অর্ডার ও সার্কুলার ছিল।

---

[২৮] Choudhury, Dilara (1995), *Constitutional Development in Bangladesh: Stresses and Strains*, University Press Limited, Dhaka, Pp. 168-169.

[২৯] হালিম, মোঃ আব্দুল (১৯৯৫), *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা, পৃ. ১০১-১০২।

এগুলো ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ, যতদিন সামরিক আইন জারী ছিল সে সময়ের মধ্যে জারী করা হয়েছিল। সূতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বৎসরের সামরিক শাসনকালে ঘোষিত বা জারীকৃত বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স, ঘোষণা, ধারা যেগুলো বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ও ক্ষমতার পরিপন্থী ছিল সেগুলোও পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করে মূলতঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও গুরুত্বকে ক্ষুন্নই করা হয়েছে। যেমন, ১৯৭৬ সালের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের জারীকৃত ১১৬ নং সামরিক আইন অধ্যাদেশে বর্নিত হয়েছে যে, সামরিক আদালতে প্রদত্ত কোন দন্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালতে আপীল করা যাবে না। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক আইন-পরবর্তী অবস্থাতে বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী এসব আদেশ, নির্দেশ, অধ্যাদেশ বৈধ করে নেয়া হয়েছিল। ফলে, সামরিক আইন থাকাকালে যেমন, তেমনি তৎপরবর্তীকালেও, ঐ ধারাগুলোর কারণে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ও তার গুরুত্ব খর্ব হয়। যদিও সামরিক আইন উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিচার বিভাগের মৌল ক্ষমতা ফিরে পাবার কথা, যেমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল ১৯৭২ সালের মূল বাংলাদেশ সংবিধানে। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সে ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তি অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে তেমনি ভাবে অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বিচার বিভাগও তার স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

তাই তাত্ত্বিক দিক থেকে যদিও চতুর্থ সংশোধনীর ফলে খর্বকৃত স্বাধীনতা অপেক্ষা তৎপরবর্তীতে বেশী স্বাধীনতা আছে বলে মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে চতুর্থ সংশোধনীর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে যে হারে খর্ব করা হয়েছিল তার থেকে পরিস্থিতির তেমন বেশি উত্তরণ ঘটেনি। কারণ মূলতঃ সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারকগণের অপসারণের ব্যবস্থা করা ও বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের কর্তৃত্ব এককভাবে নির্বাহী রাষ্ট্রপতির (কার্যকরী প্রধান) নিকটে না রেখে সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শের বিধান করা[৩০] ছাড়া তেমন কোন পরিবর্তন করা হয়নি যাতে করে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত: ১৯৭২ সালে প্রনীত মূল সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণে যতটুকু সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, সেটুকুতে ফিরে যাওয়া হয়নি, পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার নিমিত্তে সন্নিবেশিত ধারাসমূহ ফিরিয়ে আনা হয়নি।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের রাজনীতিকীকরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটা বলা যায় যে, সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুমহান লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন সত্ত্বা হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন বিচার বিভাগ নির্বাহী প্রভাব ও সরকার দলীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বিচারকার্য ন্যায়ানুগভাবে সম্পাদন করতে পারেন। বিচারপতিদের নিয়োগও সেজন্য 'অনির্বাহী' রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। তবে, কালের পরিক্রমায় ও বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে চতুর্থ ও পঞ্চম সংশোধনী ও সামরিক শাসনের অধীনে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতা প্রদানের কাজটা

[৩০] সাহা, অসীম কুমার (২০০৮), *পূর্বোল্লিখিত*, পৃ.১২৬।

অদ্যাবধি পূর্ণাঙ্গভাবে হয়ে উঠেনি। এমনকি, এতদ্সংক্রান্ত ২০০৭ সালে মাসদার হোসেন মামলার রায় প্রদান ও সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ১২ দফা নির্দেশনা দেয়ার পর ১৪ বছর পরেও সেই ১২ দফা নির্দেশনার বাস্তবায়ন হয়নি।

বরং চতুর্থ সংশোধনী ও তৎপরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের দু'টি প্রধান নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, যা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

বিচার বিভাগের রাজনীতিকীকরণ ও প্রভাব

বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার বিতর্কটি বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে শুরু হয়। পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার জন্য গুরুত্বারোপ করে আইন প্রণয়ন করা হলেও সেই আইনটি বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৬২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার বিষয়ে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক রাখার কথা বলা হয়েছে।[৩১] কিন্তু অদ্যাবধি তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

অবশেষে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়। ঐতিহাসিক মাসদার হোসেন মামলার রায়ের ভিত্তিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক ও স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।এই মামলার রায়ে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে ১২ দফা নির্দেশনা দেন।[৩২]

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ১৪ বছর হতে চললেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকটা কাগজে কলমে রয়ে গেছে। মাসদার হোসেন মামলার যে ১২ দফা নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।[৩৩]বিচার বিভাগকে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাব ফুটে উঠে যার কারণে বিচার বিভাগ বিতর্কিত হচ্ছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম মূল স্তম্ভ, তবে বাস্তবে বিচার বিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার ধারা অব্যাহত রয়েছে। অনেক আইন বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবী পর্যবেক্ষন করেছেন যে, সংবিধানের ৯৫(১) এবং ৪৮(৩) সত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি নন বরং প্রধানমন্ত্রীই বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নির্বাচন করেন।

সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচারক নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে,সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চকে রাজনৈতিক লাইনে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যেমনঃআওয়ামীলীগ কোর্ট ও বিএনপি কোর্ট।[৩৪] এছাড়াও, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক

---

[৩১] রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৯৭), *আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা*, ঢাকা, পৃ. ৬৭।

[৩২] *সমকাল*, ঢাকা, ১ নভেম্বর ২০১৯।

[৩৩] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১ নভেম্বর ২০১৬।

[৩৪]Asano, Noriyuki and Kazuki Minato, "Politicisation of the Appointment and Removal of Judges in a declining Democracy: The case of Bangladesh", *IDE Discussion Paper,* No. 758, April 2019, URL- http://hdl.handle.net/2344/00050854

সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের উদ্দেশ্যে সংবিধানের (বর্তমানে বিলুপ্ত) ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র বিচারপতিকে নিয়োগের বিধান সংযোজন করা হয়। প্রধান উপদেষ্টার পদটি ছিল সরকারের প্রধান নির্বাহীর। এর ফলে, বিভিন্ন দল তাদের সুবিধামত বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাতে নির্বাচনে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আনুকূল্য লাভ করতে পারে। যা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের সম্মুখিন করে।

ন্যায়বিচার পাওয়ার পূর্বশর্ত ন্যায়পরায়ণ, সৎ এবং দক্ষ বিচারক নিয়োগ।কিন্তু, বাংলাদেশের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করছে।উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ নীতিমালা না থাকায় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারক নিয়োগ একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, এখনো আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদায়ন, শৃঙ্খলাবিধি সহ সব কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। এতে করে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। ফলে, শেষ পর্যন্ত আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশই কার্যকর হয়ে থাকে।

আবার বিচারকরা রায় প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারদলীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাপের মুখে থাকেন। ফলে, ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়। বিচার বিভাগের এই ধরণের রাজনীতিকীকরণ এই বিভাগের চেতনাকে ক্ষুন্ন করছে। সুষ্ঠু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। বহুসংখ্যক বিচারক নিয়োগ পাওয়ার পরও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিচার বিভাগ পৃথক হয়েও আইন ও শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বহাল রেখেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কাগজে কলমে স্বাধীনতায় পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে, সামরিক শাসনের অধীনে বিচার বিভাগের যে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে তার প্রভাব পরবর্তীতে অব্যাহত থাকে। বিচার বিভাগের রাজনীতিকীকরণের ফলে বিচারকদের রায় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি রাজনৈতিক বিবেচনায় করার ফলে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাদেরও সরকারের ইচ্ছা, অনিচ্ছাকে আমলে রাখতে হয়। বিশেষ করে, যে সমস্ত রায়ের সাথে সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে। ফলে, স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা কঠিন হয়ে উঠে। বিচারকদের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাও কমে যায়।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ। এটি বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে অন্যতম। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। একটি দেশের বিচার বিভাগকে তখনই স্বাধীন বলা যাবে যখন সেদেশের বিচারকগণ রাজনৈতিক ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগের হস্তক্ষেপ ছাড়া শুধুমাত্র নিজেদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে ন্যায়বিচার

প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। বিচার বিভাগের কর্মকুশলতার উপর শাসন বিভাগের উৎকর্ষতা নির্ভর করে। ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষ বিচারের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরি। বিচার বিভাগের উপর যদি আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান থাকে তাহলে নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করা যায় না। তাছাড়া দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সবলদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও এর স্বাধীনতা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১) বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হতে হবে। বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে সৎ, দক্ষ, যোগ্য, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রার্থীরা যাতে নিয়োগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল ধরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। নিরপেক্ষ বিচার ও সুষ্ঠু বিচার আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত। বিচারকদের নিয়োগ ও বাছাই প্রক্রিয়া সুষ্ঠু না হলে বিচার কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু হওয়া অসম্ভব।[৩৫]

২) বিচারকদের চাকুরির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে।শারিরীক ও মানসিক অসার্মথ্য কিংবা গুরুতর অসদাচারণ ব্যতিরেকে কোন বিচারককে যাতে অপসারণ করা না যায় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। একবার নিয়োগ করলে তার কার্যকালের মধ্যে জুডিশিয়াল সার্ভিসের সুপারিশ ছাড়া তাকে অপসারণ করা যাবে না। বিচারকদের অভিশংসনের জন্য যদি সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকে তাহলে বিচারকরা চাকুরির অনিশ্চয়তার জন্য আশংকায় থাকেন তাহলে তাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব হবে না।

৩) বিচারকদের চাকুরিতে বহাল থাকা অবস্থায় পর্যাপ্ত বেতন ও সুবিধাদি প্রদান করতে হবে যাতে করে বিচারকেরা লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে রায় প্রদান না করেন।তারা যাতে যথাযথ মর্যদার সাথে জীবন যাপন করতে পারেন সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।[৩৬]

৪) বিচারকদের পদোন্নতি যথাসময়ে সম্পন্ন হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

তাছাড়াও বিচারকদের সামাজিক মর্যাদা, মানসম্মত বেতন প্রদান, অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান, বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ এবং বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

তাত্ত্বিক বা সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের প্রথম দশকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ দেখবার পর অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকেও বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বরূপ নির্ণয় বা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

---

[৩৫] Mollah, Md. Awal Hossain "Independence of Judiciary in Bangladesh: An overview", *International Journal of Law and Management,* February 2012, 54(1): 61-77, P- 64. Dol- 10.1108/17542431211189605

[৩৬] হালিম, মোঃ আব্দুল (১৯৯৫), *পূর্বোল্লিখিত*, পৃ- ২৪৮।

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী উদার নৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে যেমনি, তেমনি বাংলাদেশেরও বিচারপতিদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা এবং বিমূর্ত ন্যায় বিচারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে বিচার বিভাগীয় মেজাজ বা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের পদ্ধতিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখা খুবই দুরূহ। কারণ বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করে মূলতঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র ও বিচারপতিদের মতাদর্শ, মানসিকতা তথা তাদের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

বিচার বিভাগ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং এদিক থেকে বিচার করলে বিচার বিভাগের চরিত্র এবং এটা কতটুকু স্বাধীনভাবে তার কাজ করতে পারবে সেটা সমাজ কাঠামোর চরিত্র প্রকৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বাংলাদেশের সমাজ হচ্ছে শ্রেণী শাসিত ও শ্রেণী বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থা এবং এ ধরনের শ্রেণী শাসিত ও শ্রেণী বিভাজিত সমাজ হওয়াতে এখানে রাষ্ট্র একটা বিশেষ শ্রেণীর অনুকূলে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ কারণেই বাংলাদেশের আদালতের কম বেশি আধিপত্যকারী শক্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে ঝোঁক দেখা যায়।

এমতাবস্থায় আদালতের পক্ষে স্বাধীনভাবে তার কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ, তার মূল নিহিত রয়েছে সমাজের শ্রেণি বৈষম্যের মধ্যে এবং স্বভাবতই সমাজের নেতৃস্থানীয় তথা আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে সমাজের কর্তৃত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থেই আদালত ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এখানে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা আর্থিক দিক থেকে কর্তৃত্বকারী ও নেতৃস্থানীয় এবং বিচার বিভাগ যেহেতু রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীদের (সরকারের) একটা অংশ, সেহেতু এমতাবস্থায় বাংলাদেশে বিচারবিভাগের পক্ষে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিচার কার্য সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের বিচারকরদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বা স্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বিচারকদের অধিকাংশই সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তশ্রেণী থেকে এসেছে এবং অনেকটা সে কারণেই স্বভাবতঃই বিচারপতিদের মধ্যে তাদের সামাজিক শ্রেণিভুক্তদের দিকে একটু ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্নভাবে তারা তাদের সম-সামাজিক শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে কাজ করে বলে এখানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আপোষ হয়ে থাকে।

তাই বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে উপসংহারে বলা যায় যে, তাত্ত্বিক বা সাংবিধানিক দিক থেকে এখানে যেমন ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারীর চতুর্থ সংশোধনীর পর থেকে ১৯৭৬ সালে বিচারপতিদের পদচ্যুত করবার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের একক ক্ষমতার পরিবর্তে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন ও (পঞ্চদশ সংশোধনী) আদেশ (১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর-৪) দ্বারা সংশোধনের মাধ্যমে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের কর্তৃত্ব এককভাবে রাষ্ট্রপতি (কার্যকরী প্রধান)'র নিকটে না রেখে সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শের

বিধান করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অবস্থার সামান্য উন্নতি ব্যতীত সর্বত্রই এবং সর্বক্ষেত্রেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সীমিতই রয়ে গেছে।

আর তদ্রুপভাবে, যদি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা যায় তবুও দেখা যাবে যে, কার্যতঃ শ্রেণীশাসিত সমাজ হওয়াতে এখানে বিচার বিভাগের মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী শ্রেণির প্রতি কিছুটা হলেও ঝোঁক থাকে। আদালত ব্যবস্থা বাঁধা পড়েছে সামাজিক শ্রেণী স্বার্থের নিগড়ে। সর্বোপরি, বিচারপতিদের সামাজিক শ্রেণি স্বার্থের প্রতি ঝোঁক তাঁদেরকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের কাজ পরিচালনার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাই বলা চলে যে, এখানে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশের বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আছে তা বলা দুষ্কর। তদুপরি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পূর্বশর্তাবলীর অনেকগুলোই দীর্ঘদিন ধরেই অনুপস্থিত। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের রাজনীতিকীকরণের বিষচক্র বাংলাদেশের বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে বড়ভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করে ফেলেছে। দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারক নিয়োগের দীর্ঘ ঐতিহ্যও বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিচারকদের মর্যাদা, বেতন ও সুবিধাদির সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ফলেও বিচার বিভাগের স্বাধীন কর্মস্পৃহা অবদমিত হয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, *আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা*, ঢাকা, ১৯৯৭।

সাহা, অসীম কুমার, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস*, ঢাকা, ২০০৮।

হক, কাজী এবাদুল, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

হালিম, মোঃ আব্দুল, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ (বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ)* ঢাকা, ১৯৯৮।

হালিম, মোঃ আব্দুল, *সংবিধান,সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৯৫।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

Ahmed, Moudud, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman,* The University Press Limited, Dhaka, 2015.

Choudhury, Dilara, *Constitutional Development in Bangladesh Stresses and Strains,* University Press Limited, Dhaka, 1995.

Chowdhury, M. Jashim Ali, *An Introduction to the Constitutional Law of Bangladesh,* Northern University Bangladesh, Dhaka, 2010.

Chowdhury, G.W, *Constitutional Development in Pakistan,* Longman Group Ltd., London and Harlow, 1969.

Johnson, John J, *The Role of the Military in Underdeveloped Countries,* Princeton University Press, Princeton, 1962.

Maniruzzaman, Talukder, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath,* University Press Limited, Dhaka, 2009.

Sayeed, Khalid Bin, *The Political System of Pakistan,* Oxford University Press, Lohore Karachi Dacca, 1967.

Asano, Noriyuki and Kazuki Minato, "Politicisation of the Appointment and Removal of Judges in a declining Democracy: The case of Bangladesh", *IDE Discussion Paper,* No. 758, April 2019, URL-http://hdl.handle.net/2344/00050854

Hossain, M.M., ``Seperation of Judiciary in Bangladesh Constitutional Mandates and Masdar Hossain Case's Disrections: A Post Seperation Evaluation,`` *International Journal for Court Administration,* 11(2), P.4. Dol: http://dol.org./10.36745/ijca.310.

Mollah, Md. Awal Hossain, "Independence of Judiciary in Bangladesh: An overview", *International Journal of Law and Management*, February 2012, 54(1): 61-77, P- 64. Dol- 10.1108/17542431211189605

Shaon, Asif Islam, ''16th Amendment scrapped, parliament loses power to impeach judges'', *Dhaka Tribune,* 3 July 2017.

bdnews24.com, ১৯ আগষ্ট ২০১৭।

Dhaka Tribune, 18 August 2017.

The Daily Star, Dhaka, 1 December 2017.

The Daily Star, Dhaka, 06 May 2016.

The Daily Star, Dhaka, 10 March 2014.

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১ নভেম্বর ২০১৬।

প্রথম আলো, ঢাকা, ১ আগষ্ট ২০১৭।

বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা, ১ আগষ্ট ২০১৭।

বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা, ১০ জুলাই ২০১৭।

সমকাল, ঢাকা, ১ নভেম্বর ২০১৯।